শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিত উন্নয়ন ও গুণগত মান- সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত আমরা কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পাইনি। পাকিস্তান সরকার প্রাথমিক শিক্ষারও দায়িত্ব নেয়নি। প্রাথমিক শিক্ষকরা অতিসামান্য সরকারি অনুদান পেত। যা কোনো শিক্ষকের বেঁচে থাকার জন্য মোটেও বিবেচনা করা যায়না। তখন ৫ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বেশিরভাগ কলেজই ছিল বেসরকারি। সরকারি অনুদান সেগুলোতেও তেমন একটা ছিল না। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষাতেও সরকারের আর্থিক বরাদ্দ উল্লেখ করার মতো ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে প্রায় ৩৮ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণ করেন। তখন আমাদের দেশটি ছিল একটি যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা আমাদের হাতে ছিল না। তারপরও বঙ্গবন্ধু একটি জাতি-রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে দেন। কমিশনের সদস্যবৃন্দ ছিলেন দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। তারা বিশ্ববাস্তবতার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বাংলাদেশকে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একটি সুদূরপ্রসারী শিক্ষা, পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করেন -যা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে অন্যতম সেরা মেধার স্বাক্ষর বহন করে। সেই শিক্ষানীতি অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারলে আমাদের সকল শিশুকিশোর অন্তত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক স্কুলশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেতো, আমাদের জনগোষ্ঠীর বড় অংশ দক্ষ, কারিগরি জ্ঞানের শিক্ষা লাভ করতে পারতো। শিক্ষানীতিতে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সুপারিশ ছিল, দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশও ছিল। দেশপ্রেম, দক্ষতা এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম জাতিগোষ্ঠী গঠনের ব্যবস্থা তৈরির সুচিন্তিত পরামর্শ উক্ত শিক্ষানীতিতে দেওয়া ছিল। শিক্ষানীতির লক্ষ, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নে বিশ্বের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে দ্রুত আধুনিক শিক্ষা লাভে সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে- তার যৌক্তিকতা ও করণীয় নির্দেশনাও প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা ছিল। বঙ্গবন্ধু উক্ত শিক্ষানীতির পরিকল্পনাকে অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিতে নিয়ে জাতি গঠনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ রাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে যেমন হারিয়েছিল, ১৯৭২ এর সংবিধান, প্রথম পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষানীতিও বাস্তবায়নের আর সুযোগ পায়নি।

এরপর বাংলাদেশে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা নিয়েও শুরু হয়েছে ‘ যার যা খুশি তাই-ই করার’ নীতি। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে থাকে যত্রতত্র নানা ধারার এবং ধরণের নামধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়নি, ফলে বেশিরভাগ অঞ্চলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভের সুযোগ রাষ্ট্রের চিন্তার বাইরে চলে যায়। আমাদের মতো দেশে জাতীয় আয়ের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ যদি প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় না করা হয় তাহলে হতদরিদ্র এবং সাধারণ পরিবারের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার মতো সক্ষমতা বেশিরভাগ পরিবারেরই থাকে না। ফলে অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, আমাদের বিরাট সংখ্যক শিশুকিশোর শিক্ষাবঞ্চিত থেকে গেছে। কোথাও কোথাও ব্যক্তি উদ্যোগে নানা ধরণের মানহীন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছিল না। শিক্ষার দেখভাল করারও কেউ ছিল না। সেগুলোকে তখন নাম দেওয়া হয়েছিল রেজিস্টার্ড, নন- রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামেগঞ্জে তখন নানা ধরণের মাদ্রাসাও গড়ে উঠতে থাকে যেগুলোর আয় ব্যয়ের কোনো স্থায়ী উৎস বা নীতিমালা ছিল না। শহরাঞ্চলে উঠতি ধনিকদের শিশুদের জন্য কিছু কেজি স্কুল এবং বাহারি নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাও অনেকটাই একইভাবে অবহেলিত ছিল। ৯ জানুয়ারি ২০১৩ ২৬ হাজার ১৯৩ টি নন- রেজিস্টার্ড, রেজিস্টার্ড এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর ২য় বারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এনিয়ে দেশে মোট ৬৫ হাজার ৬২০ টি প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারই এই ব্যবস্থাটি কার্যকর করেছে। পুর্ববর্তী অন্য কোনো সরকারই প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিবেচনা করেনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিটি উপজেলায় একাধিক মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ সরকারীকরণ করা হয়েছে, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং অনুমোদিত আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকে এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন প্রায় ৩০ হাজারের কাছাকাছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ায় শিক্ষার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। তবে ’৭৫ এর পর শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রের চরম অবহেলার যে অবস্থা দীর্ঘদিন বিরাজ করেছিল তার ফলে দেশে অনুমোদনহীন নানা ধারার ও মাধ্যমের, নানা ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। এটি এখন গ্রামেও প্রসারিত হয়েছে। কোনো নিয়ন্ত্রণ কোথাও প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না, তেমন উদ্যোগ জনগণের দিক থেকে পাওয়ার অবস্থানও দেশে খুব একটা নেই। শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘদিন চলে এসেছে একটি হ-য-ব-র-ল অবস্থা, প্রায় ১৩ টি উপধারার শিক্ষা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করছে। শিক্ষা অনেকের কাছেই একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আবার অনেকেই এটিকে নিয়েছে নিতান্তই তাদের চাকরি তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ হিসেবে। কোথায়, কি ধরণের, কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন সেটি বিবেচনায় না নিয়েই স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাবশালী অনেকেই বাহারী নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য প্রচার- প্রচারণা, তদবির এবং নানা ধরণের প্রলোভন

দেওয়ার বিষয়ও চলছে। অথচ প্রয়োজন ছিল দেশব্যাপী ম্যাপিং এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে সেখানেই কেবল চাহিদা মোতাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে চালুর ব্যবস্থা করা। কিন্তু তেমন পরিকল্পিত ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর করতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে অনেক জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, আবার অনেক জায়গায় প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় স্বার্থান্বেষী মহল অনুমোদনহীনভাবে নানা ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে নিজেদের আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার মানের কোনো বালাই থাকে না। ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মেধার বিকাশ নিয়ে বের হয়ে আসা শিক্ষার্থীও তেমন একটা পাওয়া যায়না। অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কারণে মানসম্মত শিক্ষার ঘাটতি নিয়ে বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নামমাত্র চলছে। সচেতন অভিভাবকগণ নামীদামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে ছুটছেন। কিন্তু বেশিরভাগ শহরেও প্রত্যাশিত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সেকারণে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়ছে কতিপয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর। বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থী হারাচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও মানসম্মত শিক্ষার অভাবের কারণে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পাচ্ছে না। বাংলাদেশে এই ধরণের আপাত পরস্পরবিরোধী একটি অবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিরাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এমনটি গড়ে উঠেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে- যা নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিবীক্ষণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো অধিদপ্তরেরই নীতি, কৌশল এবং কার্যক্রমের মধ্যে ছিল না। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এখন বহুমাত্রিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী এবং মহল নানাভাবে জড়িত রয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক নানা স্বার্থও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ধরণের পরিকল্পনা, নীতিকৌশল বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। নানা ধরণের অপপ্রচার, গুজব, ধর্মীয় অনুভূতির অভিযোগ তুলে অনেকেই মানসম্মত শিক্ষার যেকোনো আয়োজনে বাঁধা প্রদানে তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর না হওয়ার কারণে যে ধরণের অবাধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ ও দর্শনের মোটেও মিল নেই। শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে এখন জেকে বসেছে শিক্ষার আদর্শ প্যাডাগোগি এবং জাতি গঠনে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার বিরুদ্ধ নানা শক্তি যারা শিক্ষাব্যবস্থায় বাণিজ্য এবং জাতি ও ধর্মীয় নানা সূক্ষ্ম ও স্থুল বিভাজন সৃষ্টিতে তৎপর। এরফলে জাতি হিসেবে আমরা বর্তমান যুগের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে বঞ্চিত করছি, পিছিয়ে পড়ছি অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার মানের অবস্থান থেকে। আমাদেরকে প্রতিবছর হারাতে হচ্ছে প্রচুর মেধাবী শিক্ষার্থীকে যারা মানসম্মত শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। দেশে এখন ইংরেজি শিক্ষার প্রতাপ এতটাই বেড়েছে যে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকার পরও শহরগুলোতে জাতীয় শিক্ষাক্রম অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সমান্তরালভাবে ইংরেজি ভার্সন চালু করতে দেখা যাচ্ছে। অথচ ইংরেজি ভাষায় পাঠদানে দক্ষ শিক্ষকের অভাব সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও মানের সংকট সবর্ত্র দৃশ্যমান। এধরণের একটি বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার অর্জন এবং সমস্যা হাত ধরাধরি করেই চলছে। জাতীয় শিক্ষানীতির অভাব এর জন্য অনেকটাই দায়ী। আমরা পরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন গড়ে তুলতে পারিনি, একইভাবে দক্ষ এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা সর্বত্র দীর্ঘদিন করতে পারিনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতেই দুই দশক পার হয়ে গিয়েছিল। গৃহীত নীতিমালাও মানসম্মত পাঠদানের জন্য মোটেও সুবিবেচিত ছিল না। সেকারণে বারবার নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে শিখন পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব সর্বত্র প্রকট হতে থাকে। শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নানা ধরণের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা চলে এসেছে। সেসবেরও পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও খুব বেশি সুফল অর্জন করা যায়নি। শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে কোচিং বাণিজ্য, নোটবই, গাইড বইয়ের ব্যবসা এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে সরকারের কোনো বাধানিষেধই কার্যকর করতে দেওয়া হয়নি ফলে সুফলও দেয়নি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদগুলো নিয়ে দেশে স্বস্তির কোনো অবস্থা তৈরি করা যায়নি। এর ফলে দেশে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা পূরণে সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরণের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেটিও এখনো পর্যন্ত খুব বেশি অর্জন করা যায়নি । এর বাইরে রয়েছে দেশে নানা ধরণের, নানা ধারারঅন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেগুলো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নানা উপসর্গ তৈরি করে রেখেছে।

এমন বাস্তবতায় মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ব্যতীত আগামীদিনের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতিযোগিতায় আমরা জাতিগতভাবে টিকে থাকতে পারার কোনো লক্ষণ দেখা যায়না। কারণ আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই একদিকে মানহীন, অন্যদিকে সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য যে ধরণের শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন তা থেকে বেশ দুরেই আমরা অবস্থান করছি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। আমাদের এমনকি উচ্চশিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে রয়েছে সেগুলোরও অবস্থা খুব একটা ভালো না। সংখ্যার দিক থেকে অনেক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও খ্যাতি অর্জনের দিকে আমাদের এইসব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান তলানিতে পড়ে গেছে। দেশে প্রয়োজনীয় গবেষণার সুযোগ বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ফলে আমাদের উচ্চশিক্ষা অনেকটাই নামসর্বস্ব এবং বেকার বাহিনী সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু উন্নত দুনিয়ার মতো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে মানসম্মত গবেষণা দ্বারা পরিচালিত করা হলে দেশে প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অসংখ্য গবেষক তৈরি হতে পারতেন- যারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারতো। তবে সরকারের দিক থেকে কয়েকবারই শিক্ষাক্রম, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিও গৃহীত হয়েছে। সেইসময় সৃজনশীল

পদ্ধতির শিক্ষাক্রম স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে চালু হয়েছিল। তাতে কিছুটা শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও এর গতি খুব মন্থর পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি সরকার নতুন, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটি বড় ধরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় এবং বাস্তব দক্ষতানির্ভর শক্তি বাস্তবায়নের জন্য যুগোপযোগী বলে বিশেষজ্ঞগণ দাবি করছেন। গত বছর থেকে এর পাইলটিং শুরু হয়েছে। এবছর এর আরো বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে একটি নতুন শিক্ষাক্রম দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা মোটেও সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রচুর প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতার বিতরণ, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে জরুরী। নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই এধরণের শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত আকারে সাফল্য নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে শিক্ষাকে প্যাডাগোগির শিক্ষণ থেকে দেখা, জানা ও বোঝার ব্যাপক ঘাটতি সংশ্লিষ্টজনদের মধ্যে রয়েছে। সেকারণে তাদের দিক থেকে নানা ধরণের বাঁধা প্রদান এবং সমালোচনারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এসবকে অতিক্রম করেই শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী আধুনিক এবং মানসম্মত করার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সরকার এবং জনগণকে দেশের সামগ্রিক শিক্ষার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে গৃহীত উদ্যোগকে বাস্তবে রুপদানের জন্য একাত্ম হয়ে কাজ করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

#

পিআইডি ফিচার